নভোমণ্ডলে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান

জ্যোতিষশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যা নভোমণ্ডলে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করে মানুষের ভাগ্যগণনা তথা ভাগ্য নিরূপণ করে। যারা এরূপে ভাগ্য গণনা করে তাদের বলা হয় জ্যোতিষী।

জ্যোতিষ একটি সংস্কৃত শব্দ। এই শব্দের একটি অর্থ হল “জ্যোতির্বিষয়ক” এবং অন্যত্র অর্থে এই শব্দের একটি অর্থ হল “জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ” এবং অন্য অর্থ “জ্যোতির্বিৎ” । জ্যোতিষ ৬ টি বেদাঙ্গের অন্যতম। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের উপলব্ধ শ্লোকগুলিতে মূলতঃ সূর্য্য-চন্দ্রের আবর্তন ও ঋতুপরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। বেদের লিপিবিদ্ধকরণের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানের দিন, ক্ষণ ও মুহূর্তাদি নির্ণয়েও জ্যোতিষের বহুল ব্যবহার ছিল। উল্লেখ্য এই যে সেই সময় জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা অভিন্ন ছিল।

বর্তমানে প্রশ্নকর্তার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে, জন্মকালে মহাকাশে গ্রহের অবস্থান নিরূপণ করে অথবা প্রশ্নের সময় গ্রহাদির অবস্থান নির্ণয় করে, অথবা হস্তরেখাবিচার, শরীরের চিহ্নবিচার ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারে প্রশ্নকর্তার ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করার জ্ঞান ও পদ্ধতিকে জ্যোতিষশাস্ত্র বলা হয়।

জ্যোতিষ্ক বিষয়ক তথ্য, সূত্রাবলী ও ব্যবহারিক প্রয়োগসমূহের সামগ্রিক জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র নামে পরিচিত। এই শাস্ত্রের উৎপত্তিকালে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এক এবং অভিন্ন ছিল। পরবর্তিকালে জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতিষ্কগুলির গতি এবং অবস্থানের ভিত্তিতে, প্রাকৃতিক এবং শারীরিক লক্ষণ অথবা দুয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তি, সমষ্টি বা দেশের ভবিষ্যৎ নিরূপণের প্রায়োগিক দিকটি নিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের সংগ্রহ হিসেবে বিস্তার লাভ করে।

ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে জ্যোতিষশাস্ত্রকে একটি বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে আলোচিত হত এবং অন্যান্য গবেষণার সাথে সংযুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

জ্যোতিষের বিভিন্ন শাখা আছে। এই শাখাগুলির নাম অনেকক্ষেত্রে প্রবর্তকের নাম নামানুসারে হয়েছে। পরাশর, জৈমিনি, নাড়ী, কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি এবং লালকিতাব বহুব্যবহৃত কিছু পদ্ধতি। এর মধ্যে পরাশর পদ্ধতি প্রাচীন ঋষি পরাশর, জৈমিনি পদ্ধতি ঋষি জৈমিনি, এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি বিখ্যাত জ্যোতিষী কে এস কৃষ্ণমূর্তির (১৯০৮-১৯৭২) নামানুসারে নামকরণকৃত। নাড়ীজ্যোতিষ বহু ঋষির দ্বারা প্রণীত।

এছাড়াও সামুদ্রিক জ্যোতিষ, জ্যোতিষের এক শাখা যা শারীরিক চিহ্নবিচার করে ভবিষ্যদ্বানী করতে ব্যবহৃত হয়। হস্তরেখাবিদ্যা বা হস্তসামুদ্রিক বিদ্যা এরই একটি প্রশাখা। জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত ।

প্রতিটি শাস্ত্রের মতো জ্যোতিষশাস্ত্রেরও কিছু একক আছে। জন্মরাশি সেই এককগুলির একটি।পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের আবর্তন পথকে ৩৬০ ডিগ্রি সমমানের একটি বৃত্ত আকারে এঁকে ১২ টি অংশে বিভক্ত করলে প্রায় ৩০ ডিগ্রী সমমানের যে বৃত্তচাপ পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিকে এক একটি রাশি বলা হয়। বাংলায় বারোটি রাশির প্রচলিত নামগুলি হল ১) মেষরাশি ২) বৃষরাশি ৩) মিথুনরাশি ৪) কর্কটরাশি ৫) সিংহরাশি ৬) কন্যারাশি ৭) তুলারাশি ৮) বৃশ্চিকরাশি ৯) ধনুরাশি ১০) মকররাশি ১১) কুম্ভরাশি ১২) মীনরাশি। শিশুর জন্মের স্থানীয় সময়ে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে সে রাশিকে শিশুর জন্মরাশি বলে। বর্ষপঞ্জিতে চন্দ্রের অবস্থান উল্লেখ থাকে। বর্তমানে পঞ্চাঙ্গ বিষয়ক জ্যোতিষশাস্ত্র সফটওয়্যার এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে জন্মতারিখ ও সময় দিয়ে চন্দ্রের অবস্থান জানা যায়।

এই রাশিগুলি আবার কিছু নক্ষত্র (প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রপুঞ্জ) নিয়ে গঠিত। মহাকাশে এই নক্ষত্রগুলির অবস্থান দূরবীণের সাহায্যে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। পৃথিবীর চারদিকে

মহাকাশকে পূর্বদিগন্ত, মধ্যগগন এবং পশ্চিমদিগন্তের সংযোগকারী বৃত্তাকারে কল্পনা করলে প্রতিটি নক্ষত্র মহাকাশে ১৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট বৃত্তচাপ পরিমাণ অংশ নির্দেশ করে। এক একটি নক্ষত্র পরিমান বৃত্তচাপকে চারটি সমান অংশে ভাগ করলে এক একটি ভাগকে পদ বা চরণ বলে। প্রতিটি পদ তাই ৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট পরিমান বৃত্তচাপ নির্দেশ করে। প্রতিটি রাশি ৯ টি নক্ষত্রপদ পরিমান বৃত্তচাপ নির্দেশ করে যা ৩০ অংশের (ডিগ্রির) সমান। মেষ রাশি, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের ১ম পদ নিয়ে গঠিত। পরবর্তি রাশি বৃষ, কৃত্তিকা নক্ষত্রের অবশিষ্ট ৩টি পদ, রোহিনী নক্ষত্র এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম ২ টি পদ নিয়ে গঠিত। এই রাশি, নক্ষত্র এবং নক্ষত্রপদগুলি তাই মহাকাশের মানচিত্রে এক একটি স্থাননির্দেশক।

জ্যোতিষ গণনায় ভারতীয় পদ্ধতিতে চন্দ্রকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। চন্দ্র এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে অবস্থান পরিবর্তন করে আড়াই দিনে। এভাবে চন্দ্র এক মাসের মধ্যে সৌরপথের বারোটি চিহ্ন বা রাশিই অতিক্রম করে। ভারতীয় জ্যোতিষে ২৭টি নক্ষত্রপুঞ্জকেও বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষী কারও কোষ্ঠী নির্ণয়ে তার জন্মচিহ্ন (চন্দ্রচিহ্ন) এবং জন্মনক্ষত্র উভয়ই বিবেচনা করেন।

সাধারণভাবে, জন্মকালে পূর্বদিগন্তে যে রাশির যত অংশ উদয় হয় সেই রাশির তত অংশ জাতকের জন্মলগ্ন ধরা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি জন্মকালে ধনুরাশি ৫ ডিগ্রি ২০ মিনিট উদয় হয়ে থাকে তবে জাতকের জন্মলগ্ন হবে ধনু। এই প্রকারে প্রতিদিনে জন্মসময়ের ভিত্তিতে মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি ১২ প্রকারের লগ্ন হয়ে থাকে। জন্মলগ্নের ভিত্তিতে ১২ টি ভাবের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ বিচার করা হয়ে থাকে। ভাগ্যফল গণনায় এই ভাবগুলিই মানুষের জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

রবি মঙ্গল শনি রাহু ও কেতু সর্বদা পাপ ফল দিয়ে থাকেন।কৃষ্ণাষ্টমী হতে শুক্লাসপ্তমী পর্যন্ত ক্ষীণ চন্দ্রও পাপ ফল প্রদান করেন।বুধ পাপ গ্রহযুক্ত হলে পাপ অন্যথায় শুভ গ্রহ বলে বিবেচিত হবে।বৃহস্পতি ও শুক্র সর্বদাই শুভফল দিয়ে থাকেন।সাধারণত পাপগ্রহ যে ঘরে বা ভাবে থাকেন সেই ভাবের অশুভ এবং শুভ গ্রহ যে ভাবে থাকেন সেই ভাবের শুভ হয়।দশমে ও একাদশে যে গ্রহই থাকুন শুভফল প্রদান করেন। ষষ্ঠস্থ অর্থাৎ শত্রুভাবস্থ শুভগ্রহ শত্রু বৃদ্ধি করেন।অনুরুপভাবে শত্রু ভাবস্থ পাপ গ্রহ ভাবের অশুভ করায় অর্থাৎ শত্রুর অশুভ করায় কার্য্যতপক্ষে জাতকেরই শুভ করেন।তৃতীয় অর্থাৎ ভাতৃভাবস্থ শুভ গ্রহ জাতকের পক্ষে অশুভ ফলপ্রদ।কিন্তু ভাতৃ পক্ষে শুভ। লগ্ন চতুর্থ সপ্তম ও দশম রাশির নাম কেন্দ্র। লগ্ন নবম ও পঞ্চম রাশির নাম ত্রিকোণ।কেন্দ্রত্ব ও কোণত্ব উভয়ের বিচার ক্ষেত্রে লগ্নের কেন্দ্রত্বই প্রধান বলে বিবেচিত।কেন্দ্রস্থ শুভ গ্রহ বিশেষ শুভ ফল এবং কেন্দ্রস্থ পাপগ্রহ বিশেষ ভাবে অশুভ ফল প্রদান করেন। ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানের নামান্তর দুঃস্থান।দুঃস্থানে যত কম গ্রহ অবস্থান করেন ততই ভালো।

কোষ্ঠী জন্মপত্রিকা। এতে নবজাতকের জন্মসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও সঞ্চরণ অনুযায়ী তার সমগ্র জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। এ জন্য জন্মসময়টি সঠিকভাবে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে কোষ্ঠী গণনা সঠিক হয় না। প্রাচীনকালে বিশেষ পদ্ধতিতে এ জন্মসময় সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হতো।

কোষ্ঠী অনুযায়ী কারও ভবিষ্যৎ গণনার সময় তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়, যার নাম ‘ভাব’। বারোটি ভাব হচ্ছে তনু (শরীর), ধন, সহজ (সহোদর), বন্ধু (এবং মাতা), পুত্র (এবং বিদ্যা), রিপু (এবং রোগ), জায়া (বা স্বামী), নিধন (মৃত্যু), ধর্ম (এবং ভাগ্য), কর্ম (এবং পিতা), আয় ও ব্যয়। যে রাশিতে লগ্ন অবস্থিত সেখান থেকে তনুর বিচার শুরু হয়, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাব গণনা করা হয়।

মোট বারোটি ভাব.... লগ্ন থেকে দ্বাদশ, এর মধ্যেই সব গ্রহদের বিচরণ! এই দ্বাদশ ভাব আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত !

পঞ্জিকা বছরের প্রতিদিনের তারিখ, তিথি, শুভাশুভ ক্ষণ, লগ্ন, যোগ, রাশিফল, বিভিন্ন পর্বদিন ইত্যাদি সংবলিত গ্রন্থ। একে পঞ্জী বা পাঁজিও বলা হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একে বলা হয়েছে ‘পঞ্চাঙ্গ’। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এটি এই নামে পরিচিত। এর কারণ এতে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ প্রধানত এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে। বাংলায় অবশ্য এটি পঞ্জিকা নামেই সুপরিচিত।

বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যা পরস্পরের জন্মরাশ্যাদি নিয়ে যে শুভাশুভ বিচার করা হয়

তাহাকে যোটক বিচার বলা হয়। সে যোটক বিচার আট প্রকারঃ বর্ণকুট, বশ্যকুট, তারাকুট, যোনিকুট, গ্রহমৈত্রীকুট, গণমৈত্রীকুট, রাশিকুট, ত্রিনাড়ীকুট।

প্রতিকার:-- মানুষের কর্মই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সুকর্মের সুফল ভোগ করতে চেয়েছে আর দুষ্কর্মের কুফল এড়াতে চেয়েছে। অনভিপ্রেত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের উপায়কেই প্রতিকার বলে।

তবে সব রকমের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করা যায় না। কি ধরনের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করা যায় আর কি ধরনের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করা যায় না সেটা বলতে গেলে কী ধরনের কর্ম থেকে সেই ভবিষ্যৎ লেখা হয়েছে তা আলোচনা প্রয়োজন।

সঞ্চয়ের কালভেদে কর্ম চার প্রকার - প্রারব্ধ, সঞ্চিত, ক্রিয়মান এবং আগম কর্ম। সমস্ত পূর্ব জন্মের কর্ম হল প্রারব্ধ কর্ম। ইহজন্মের যে কর্ম এই জীবদ্দশাতেই ভোগ করা যায় তা ক্রীয়মান কর্ম। ইহজন্মের যে কর্ম ভোগের পূর্বেই মৃত্যু হয় তা হল সঞ্চিত কর্ম। প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম ভবিষ্যৎ জন্মের যে কর্ম নির্দেশ করে তাই আগম কর্ম। প্রতিকার ক্রিয়মান কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের চেষ্টা করে থাকে।

কর্ম আবার ফলের নিশ্চয়তাভেদে তিন প্রকার। দৃঢ় কর্ম, অদৃঢ় কর্ম এবং দৃঢ়-অদৃঢ় কর্ম। দৃঢ় কর্মের ফল প্রায় অপরিবর্তনীয়। অদৃঢ় কর্মের ফল প্রতিকার এবং চেষ্টার দ্বারা অথবা শুধুমাত্র চেষ্টার দ্বারা সহজেই পরিবর্তনীয়। দৃঢ়-অদৃঢ় কর্মের ফল নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং প্রতিকারের দ্বারা কিছুটা পরিবর্তনীয়।

আধ্যাত্মিক, কার্মিক, ঔষধীক পদ্ধতিতে এবং রত্নধারণের মাধ্যমে প্রতিকার বিধান করা হয়ে থাকে। মন্ত্রজপ, যন্ত্রস্থাপনা, তন্ত্রসাধনা, পূজা ও দান ইত্যাদি আধ্যাত্মিক প্রতিকারের পথ। পূণ্যকর্ম, তপ, ত্যাগ, সাম্যভাব অবলম্বন ইত্যাদি হল কার্মিক প্রতিকার। ভেষজ, ধাতব ও রাসায়নিক প্রতিকার হল ঔষধীক প্রতিকারের উদাহরণ। জ্যোতিষীগণ প্রতিকারের জন্য সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, কার্মিক প্রতিকার এবং উদ্ভিদমূল, ধাতু ও রত্নধারণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হাজার হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে ভারতে এই জ্যোতিষ – বিদ্যা ও সামুদ্রিক বিদ্যা চলে আসছে । তারপর কালক্রমে যত দিন যেতে থাকে, ততই এই বিদ্যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সারা পৃথিবীর মধ্য জ্যোতিষচর্চ্চা , সামুদ্রিক বিচার অর্থাৎ হস্তরেখা বিচার প্রভৃতি সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে । তারপর ভারত থেকে আরব-বণিকদের মাধ্যমে এই বিদ্যা আরবে ছড়িয়ে পড়ে । তারপর মিশরে পৌঁছায় এবং অনেকে উন্নত হয় । ক্রমে মিশর থেকে গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য দেশে গুলিতে এই শাস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে ।

যিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করেন, তিনি জ্যোতিষী নামে পরিচিত। আধুনিককালের জ্যোতিষীগণ প্রতীকের মাধ্যমে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে থাকেন। এছাড়াও এটি এক ধরনের কলাশাস্ত্র বা ভবিষ্যৎকথন হিসেবে পরিচিত।